Vol. 49 | No. 3 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুক্তিপথে একপর্বের আবর্তন

Volume	49
Issue	3
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সিরাজ সালেকীন
Published online	June 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v49i3(2).4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i3(2).4
Pages	৭৭-৮৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মুক্তিপথে একপর্বের আবর্তন

Check for updates

সিরাজ সালেকীন*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব একাধারে আত্মপরিচয়, যা মূলত অহং-লগ্ন, এবং নতুনতর পরিসরের সূচনা ঘটায়। সময়-সমাজ-সংস্কৃতিতে প্রতিভার মূল্য মানবিক উত্তরাধিকার অনুসন্ধানে, স্মৃতির সঙ্গে সত্তার যোগ সাধনে এবং ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে। প্রত্যক্ষভাবে এতে বস্তুগত উত্তরণ থাকে স্বল্প, অবস্তুগত সাংস্কৃতিক ও মননের গতিধারা বহমান থাকে ফল্গুস্রোতের মতো অথচ অফুরান। প্রতিভা শেষপর্যন্ত সাংস্কৃতিক স্মারক, প্রথাবদ্ধ জীবনকে এই প্রতিভা নতুন বিধি দেয়, জলাচল বাধা দূর করে এবং বৈচিত্র্যে আনে ঐক্য। যদিও মুক্তি প্রসঙ্গে বিতর্ক থাকতে পারে — এর সংজ্ঞার্থ বা ব্যবহারোপযোগী মাত্রা নিয়ে, তবু জীবনের ধর্ম যদি গতি তাহলে বাধা অতিক্রমের চেষ্টা বা অতিক্রমের চেষ্টায় সফলতার নাম মুক্তি। জড়বস্তুর মুক্তির প্রসঙ্গ অবান্তর, প্রাণের ক্ষেত্রেই তা গ্রাহ্য; অস্তিত্ববানের আত্মপরিচয়, সময় ও উত্তরণধর্ম মিলে তৈরি হতে পারে মুক্তির ধারণা। মুক্তির জন্য নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া প্রারম্ভিক ও প্রধান শর্ত; প্রাণের চিন্তায় মুক্তির নিবন্ধন ঘটে, এরপর এই বোধ পরিসর খোঁজে। ব্যক্তির বৈশ্বিক যোগ আত্মসংযোগে ধন্য হতে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার সংলগ্ন হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, আধ্যাত্মিকতা মূলত প্রথাগতভাবে ধর্মীয় নয়। এজন্যই মুক্তির বস্তুগত দিক যেমন আছে তেমনি অবস্তুগত অনির্দিষ্ট, রহস্যময় নিরুদ্দেশ যাত্রাও থাকতে পারে। সময় ও উত্তরাধিকার আত্মস্থ মনের ধর্মই নির্ধারণ করে জীবনের গতিপথ, পরিণামে মুক্তির গতিপ্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকাল, উত্তরাধিকার ও আত্মস্থ পদক্ষেপ বিষয় স্মরণে রেখে আমরা *সন্ধ্যাসংগীত* [১২৮৮] থেকে *মানসী* [১২৯৭] কাব্য পর্যন্ত রাবীন্দ্রিক যাত্রাপথের সঙ্গী হতে চাই, উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষণ ও সন্ধান।

রবীন্দ্রনাথ কালের বা উত্তরাধিকারের যোগসূত্র কখনো অস্বীকার করেননি। মানুষ হিসেবে চিন্তা ও কর্মের দায় এড়ানো যেমন অসম্ভব, ব্যক্তি তেমনি আত্মলিপিবদ্ধ না-হয়ে চলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষস্বভাবী; আলোর নির্ভরতা তাঁর প্রবাদপ্রতিম, ভূমি তাঁর রক্তমজ্জা এবং আমৃত্যু তিনি প্রাণ হারাননি, থেকেছেন সময়ের যোগে। এই রসায়নের অনুঘটক তাঁর হৃদয়, আমরা মানছি মুক্তিদর্শনে হৃদয়ের ধর্মই প্রধান। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে লিপিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথে, প্রথমত কবিতায়। ভারতাত্মার কেন্দ্রে ইয়োরোপীয় আন্তঃসংযোগ যদিও তৈরি করে সঙ্করতা, ইতিনেতি মিলিয়েই তা মানবধর্ম। অস্বীকার করার উপায় নেই অর্থ ও জীবনধর্মের সাযুজ্য-সংযোগ সত্ত্বেও রাজনৈতিক অধস্তন পুরোটা পায় না এবং না-পাওয়ার প্রেক্ষাপটে হলেও সমন্বয়টি মেনে নিতে বাধ্য হয়। গ্রহণ ও ধারণের ক্ষমতা অধস্তনকে যেমন প্রতিভাকেও তেমনি বাঁচিয়ে রাখে, কর্তৃত্বের পথেও নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের কেন্দ্র তাই একদিকে সময়ধর্ম — আত্মসন্ধান ও উত্তরণের

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মাত্রা নিয়ে, তেমনি প্রতিভার জায়মান ধর্ম ভবিষ্যগতির আস্থা। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের 'কপিবুক-যুগের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল সন্ধ্যাসংগীত।' ['সূচনা', *সন্ধ্যাসংগীত*]। রবীন্দ্রজীবনেও অনুসরণ-অনুকরণের পূর্বপ্রথা ছিল, কিন্তু প্রথায় প্রতিভার মুক্তি নেই এবং স্বভাবত তা পরিত্যজ্য। বিশেষত সমাজ-সময়ের চিন্তাকাঠামোতে যে পরিবর্তন তা প্রতিভা ধারণ করতে না পারলে, অর্থাৎ ব্যক্তির চিন্তাকাঠামোর স্বাতন্ত্র্য তৈরি না হলে প্রকাশও প্রথাগত হতে বাধ্য। আঙ্গিকের পরিবর্তন মূলত চিন্তা-পরিবর্তনের সূচক। এই স্বাতন্ত্র্যচিন্তার সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ আত্মমুক্তি ও কাব্যমুক্তির যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন : '...সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে। সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।' ['সূচনা', *সন্ধ্যাসংগীত*]। স্বাতন্ত্র্যের অহংকার রবীন্দ্রনাথ গোপন করেননি, আত্মপরিচয়ও স্পষ্ট করেছেন এবং নির্ধারণ করতে চেয়েছেন রাবীন্দ্রিক পথ। তাঁর ঝরে পড়বার আশংকাহীন সতেজ 'আমের গুটি' *সন্ধ্যাসংগীত*; তবে মেনে নিয়েছেন যে রসে ফলের মূল্য তা তখনো অনুপস্থিত। অন্যত্র লিখেছেন : '...সন্ধ্যাসংগীতের পর্বে আমার মনে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন চলছিল।' ['সূচনা', *প্রভাতসংগীত*]। হৃদয়ের পথে, যা স্বভাবেরই অন্তর্গত — রবীন্দ্রনাথ সন্ধান করেছেন কাব্যপথ। এর প্রমাণও আছে কাব্যের কবিতাবলিতে — কবির সমকালীন বোধকে তাড়িত করেছে অবসাদ, বিষণ্ণতা, হাহাকার আর অকারণ অনির্দিষ্ট মন-উতল বিরহ। প্রায়শ যুক্তিবন্ধনহীন নৈরাশ্যবেদনা আহত করছে কবিকে, বিশেষ করে উদ্ধারের কোনো পথ পাননি, মূলত উদ্ধারের পথ তিনি খুঁজতেই যাননি। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে 'সন্ধ্যা', 'গান আরম্ভ', 'তারকার আত্মহত্যা', 'আশার নৈরাশ্য', 'পরিত্যক্ত', 'সুখের বিলাপ' একাধিক্রমে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই; 'দুঃখ-আবাহন' কবিতায় এই বক্তব্যের সারসত্য :

> আয় দুঃখ, আয় তুই,
> তোর তরে পেতেছি আসন,
> হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
> বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
> বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস শোষণ;
> জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ।
> হৃদয়ে আয় রে তুই হৃদয়ের ধন। ['দুঃখ-আবাহন', *সন্ধ্যাসংগীত*]

হৃদয়-আবেগকে তাৎপর্যময় করতে পারে মননের পরিশীলনে, কিন্তু এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। সূচনায় রবীন্দ্রনাথ তাই অনেকাংশে আত্মবদ্ধ, রক্তাক্ত – পরিণামে তা অরাবীন্দ্রিক হলেও এখন অসত্য বা অবাস্তব নয়। দুখঃবাদী একটি ঘূর্ণন, বিষাদের মর্মান্তিক চাপ, রক্ত-উচ্ছল থৈ থৈ হৃদয়বৃত্তি এবং অনুভবে বৈশ্বিক সংগতির অভাবও তাঁর সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিপথ ও প্রকৃতপথের সূত্রগুলো কার্যকারণে আবছা লক্ষ করেছেন, আত্মস্থ করা কঠিন ছিল — একমুখী হৃদয়নির্ভরতাই এর কার্যকারণ। গ্রন্থ-নামের মধ্যেই ইঙ্গিতময় কূটাভাসটি আছে, অপরিচিত অধরা এক অবসানের মুখোমুখি তিনি যার কোনো গভীরতর বাস্তব ভিত্তি না থাকলেও কল্পভিত্তি বিদ্যমান।

সময় অমোঘ শুশ্রূষাকারী, সময়ের অভিজ্ঞতাও বলা যায় একে। রবীন্দ্রনাথ অবসানের বোধ থেকে একসময় পাশ ফিরেছেন, পৌঁছে যেতে চেয়েছেন প্রভাতের আলোতে। এই হল প্রকাশধর্মী অস্তিত্বের ঘোষণা, প্রতীকী অন্ধকার পশ্চাতে ফেলে সূর্যালোকে পথ চিনে নেবার প্রচেষ্টা। আলোকিত মুক্তির পথ রবীন্দ্রদর্শনের প্রধান উপাদান; গেঁথে-ফেলা জল-ঘূর্ণন নয়, জীবনের স্রোত-গতি তাঁর আরাধ্য। আবদ্ধতার বিপরীতে আলো-অন্ধকার-আলোর চক্রাকার প্রতিফলন নিয়েই তৈরি হয় জীবনের পথ। এটা যেমন কাব্যাঙ্গিকের তেমনি জীবনদর্শনের সত্য। *সন্ধ্যাসংগীত* কাব্যের তুলনায় *প্রভাতসংগীত* [১২৯০] যে অগ্রসর কাব্যধারা তা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। এই আত্মপ্রকাশ-প্রসার ও প্রাগ্রসরতার বাস্তবতা সম্পর্কে কবি জানাচ্ছেন : 'প্রভাতসংগীতের ঋতুতে আপনা-আপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে এক-আধটা মননের রূপ, অর্থাৎ ফুল নয় সে, ফসলের পালা, সেও অশিক্ষিত বিনা চাষের জমিতে।' ['সূচনা', *প্রভাতসংগীত*]। চিন্তাকাঠামোর পরিবর্তনের সূত্রে হৃদয়ের প্রাধান্য থেকে রবীন্দ্রনাথের মননের পথে অগ্রসর হওয়াই এই কাব্যমুক্তির পথ বিবেচনা করা যায়। বিশেষভাবে অনুভব করা যায় *সন্ধ্যাসংগীত* কাব্যে আবেগের বদ্ধ-সংকীর্ণ একটি স্থানে স্থির ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু *প্রভাতসংগীত* কাব্যের মাধ্যমেই কবি আহ্বান শুনতে পেয়েছেন বাইরে বেরিয়ে আসবার। আবেগের বশবর্তী হয়ে ফুলের কীটের মতোই একদা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন আত্মবদ্ধ স্থান, সেই কারাগার তুল্য অবস্থা : 'মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই/রচিলি নিজের কারা,/আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া/আপনি হইলি হারা।' ['আহ্বানসংগীত', *প্রভাতসংগীত*]। রবীন্দ্রনাথ এই বোধে উত্তীর্ণ হয়েছেন, কেবল আপনার ভেতরে আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই জগৎকে অনুভব করা যায় না, আসতে হবে বাইরে। এই আবদ্ধতা 'একটি রোগের মতো' এবং এখানে কান্না ছাড়া কিছু নেই, তৈরি হয় কান্নারই মায়া; 'রোদন, রোদন, কেবলি রোদন,/কেবলি বিষাদশ্বাস —/লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে/কেবলি কোটরে বাস।' ['আহ্বানসংগীত']। এই বন্দিদশা থেকে মুক্তির জন্য ভ্রমরের মতো বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। বাইরে আছে মুক্তি বা আত্মপ্রকাশের গান — ফুল উঠবে ফুটে : 'বাহিরে আসিয়া উপরে বসিয়া/ কেবলি গাহিবি গান,/তবে সে কুসুম কহিবে রে কথা,/তবে সে খুলিবে প্রাণ।' ['আহ্বানসংগীত']। ফুলের মতো প্রাণের প্রকাশের জন্য চাই আত্মবদ্ধতার মোচন। এই চেতনার পথেই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা, বলা যায় রাবীন্দ্রিক চেতনার সূচনামুখ। এখানেও বদ্ধ আঁধারগুহায় আলোর স্পর্শে জেগে উঠে প্রাণ, যদিও এখনো পর্যন্ত একক রবীন্দ্রনাথ আপনাতেই আলোর স্পর্শে আনন্দিত। এই আলোর চেতনা থেকেই আসে প্রকাশ বা আত্মপ্রকাশের ব্যাপার। একাকী হৃদয়বদ্ধ আবেগের অন্ধকার পেছনে ফেলে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে উদ্ঘাটন করেছেন বিশ্বপ্রকাশিত আলোর প্রভাতে। বলেছেন : 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!/জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!' ['প্রভাত-উৎসব', *প্রভাতসংগীত*]। জগৎ কেবল নিজেকে নিয়ে নয়, মানুষের সঙ্গ তাই রবীন্দ্রনাথের জন্য অনিবার্য; সেই কথাও বলেছেন অকপটে : 'ধরায় আছে যত মানুষ শত শত/আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।' বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের এবং এই সম্পর্ক পারস্পরিক : 'পরান পুরে গেল হরষে হল ভোর/জগতে যারা আছে সবাই প্রাণে মোর। ...জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ/জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে একি গান!' ['প্রভাত-উৎসব']। এই একতার ও সমবন্ধনের গানেই আলোকিত অন্তর, মানবীয় মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথকে আত্মমুক্তির পথ করে দিয়েছে মানব সঙ্গ বা বিশ্বের সঙ্গে আন্তরিকতার যোগসন্ধানের পরম্পরা। *প্রভাতসংগীত* কাব্যে বদ্ধ আবেগ থেকে মুক্তির পথে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন তিনটি কবিতাকে — 'অনন্ত জীবন', 'অনন্ত মরণ' ও 'প্রতিধ্বনি'। তিনটি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রজীবনভাবনার মননির্ভরতা। ক্ষুদ্রত্ব অতিক্রমণের একটি প্রবল পিপাসা এই তিনটি কবিতাতে বিদ্যমান। ক্ষুদ্র জীবন অনন্ত জীবনে মুক্তি পায়, তেমনি প্রতিদিনের মৃত্যুও অনন্তজীবনকে আরো প্রসারিত করতে থাকে। এইসব রাবীন্দ্রিক বক্তব্যকে আত্মমুক্তির বিশেষ প্রবণতার আধ্যাত্মিকতা হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। বিষাদ-অতিক্রমী আনন্দের পথযাত্রা আছে 'অনন্ত জীবন' কবিতায় :

অধিক করি না আশা, কিসের বিষাদ,
জনমেছি দু দিনের তরে —
যাহা আসে তাই আপনার মনে
গান গাই আনন্দের ভরে। ['অনন্ত জীবন', *প্রভাতসংগীত*]

তাই বলে রবীন্দ্রনাথ এ পর্যায়ে ক্ষণবাদী নন; প্রাথমিকভাবে তা বিষাদ অবসানের সূচনা; পরে স্পষ্ট করেই বলছেন 'এ জগতে কিছুই মরে না', অনন্তের যাত্রারও পরিণাম আছে, যেমন নদীস্রোতে মাটিকণা মেশে সমুদ্রে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধান অনন্তের ধারণা; অনন্ত বাদী রবীন্দ্রনাথের এই বোধ শেষপর্যন্ত স্থির হয়েছে বহু বাঁক পেরিয়ে নিজেকে অশেষ করার মধ্যে। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক যোগ সন্ধানের নাম যদি হয় আধ্যাত্মিকতা, তবে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিবাদী আধ্যাত্মিক এবং এর সূচনাও ঘটে এখানে। কবি আবিষ্কার করে নিয়েছেন পরম্পরার পথচলা, শুনতে পেয়েছেন অমৃতের বাণী এবং নবীন এই স্থির প্রাজ্ঞ বোধই অনন্ত জীবনস্রোতে মিশেছে। এতে প্রাত্যহিক অনির্দিষ্ট না-পাওয়ার বিষাদ থেকেও মুক্তি পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির সত্যে জীবন-মৃত্যুর ক্ষুদ্র সীমাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। মৃত্যুও তাঁর জীবনের সূচনা হিসেবে নতুন অর্থ পেল 'অনন্ত মরণ' কবিতায়। আনন্দে আর গতিতে জীবনের মুক্তি; এর প্রমাণ আছে 'পুনর্মিলন', 'মহাস্বপ্ন', 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়', 'স্রোত' কবিতায়। কবির নিকট স্রোত বা গতির নামই জীবনমুক্তি; তিনি একাকিত্ব নিয়েও ভীত, থাকতে চান জনসংঘে জগতের সঙ্গে; 'স্রোত' কবিতায় লিখেছেন : 'জগৎ হয়ে রব আমি, একেলা রহিব না।/মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা।' ['স্রোত', *প্রভাতসংগীত*]। পরার্থে বিলিয়ে যাওয়া নয়, অমৃতের সঙ্গলাভ ঘটে; কেননা সংঘই জীবনের পথ। জীবনে অপরের ভালোবাসা পেয়ে কবির আপনার উপর আস্থা ফিরে এসেছে; এই আস্থাই সত্যিকার জীবন সৃষ্টি করতে পারে। এই নতুন পথ, রবীন্দ্রনাথেরই পথ : 'জেগেছে নূতন প্রাণ, বেজেছে নূতন গান,/ওই দেখ পোহায়েছে রাতি।/আমারে বুকেতে নে রে, কাছে আয় — আমি যে রে/ নিখিলের খেলাবার সাথি।' ['সমাপন', *প্রভাতসংগীত*]।

রবীন্দ্রনাথের সর্বদাই আকাঙ্ক্ষা ছিল ঢুকবেন জীবনের গভীরে, কেননা জীবনহীন ভাসমান নিরুদ্দিষ্টতা তাঁর নিকট ধরা দিয়েছে সংকটরূপে। বস্তুহীন মূলহীন কার্যকারণহীন অনিশ্চিত বেদনাবোধ কোনো কাজের কথা নয়, কবি নিজেই বলেছেন 'পূর্বে বেদনা ছিল অনুদ্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ ব'কে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে।' ['সূচনা', *ছবি ও গান*]। রূপের আকর্ষণে দায় থাকে, এই দায় মানুষ ও মানবসংসারে টেনে নেয় কবিকে। হয়ত

তাতে রূপাবয়বের স্পষ্ট ও যথার্থ পরিচয় নেই, তবু বীক্ষণের দৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যক্ষতার মূল্যও কম নয়। *ছবি ও গান* [১২৯০] কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবি নিজে জানাচ্ছেন : "ছবি ও গান' কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।" ['সূচনা', *ছবি ও গান*]। কবিজীবনের অনুদ্দিষ্ট বেদনার পরে এল একটি শান্তভাব। রূপ খুঁজতে বেরিয়ে কবিমন পাচ্ছে কেবল 'আলো-আঁধারে রূপের আভাস'। জীবনপ্রবেশের 'বাতায়নে' এই মুহূর্তে কবির অবস্থান, সংসার-প্রবেশ সম্পূর্ণ ঘটেনি। এই অস্পষ্ট জীবনরূপের প্রকাশ ও ইঙ্গিত আছে 'কে?' কবিতায় : 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে/বসন্তের বাতাসটুকুর মতো!' ['কে?', *ছবি ও গান*]। এই আভাসই পরবর্তীকালে পথ তৈরি করে দেবে, পথই পথের জননী। ফুল ফুটিয়ে যাওয়ায় যদি আত্মবিকাশ বা সৌন্দর্য বিস্তারের দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায় তাহলে এই পথেই রাবীন্দ্রিক মুক্তি, কেননা ফুলই জন্ম দেবে ভবিষ্যৎ ফল। রোম্যান্টিক বিবেচনায় এই যাত্রায় নিরুদ্দেশের আশংকা প্রবল — একথাও মানতে হবে। কবি অন্তরে অজানা যে আহ্বান ও সুরের উত্থান অনুভব করছেন তা বৃহৎ অর্থে আত্মজাগরণের অংশভুক্ত, এই জাগরণ আত্মবদ্ধ নয় নিশ্চিতভাবেই — প্রাণের মুক্তি বিস্তারে, বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ ও অবস্থান নির্ধারণে। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বযোগে নিরুদ্দেশের লাগাম টেনে ধরেন, বিশেষভাবে ভারতসঙ্গ রবীন্দ্রচেতনার প্রাণভোমরা। অজানা রহস্যে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ ভারতঋষির আলোক স্থিতধী ব্যাগ্র প্রকাশের সঙ্গেও যোগ হারাননি। *ছবি ও গান* কাব্যের 'কে?' কবিতার সঙ্গে 'যোগী' কবিতা মিলিয়ে পড়লেই রবীন্দ্রমনের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বযোগেই রবীন্দ্রনাথের মননের বিশেষ প্রকাশ, ক্ষুদ্রত্ব অতিক্রমণের চেষ্টা — এটাই রবীন্দ্রনাথের পর্যায় অতিক্রম, কবিজীবনেরও মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথের *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী* [১২৯১] মূলত বয়সোচিত আকর্ষণ ও নিরীক্ষার ফল। আত্মস্থ ঐতিহ্য সমকালে কবির আন্তর আনুকূল্য লাভ করেছে বলেই এই কাব্যে উল্লাস ও বিরহ একাধারে মিলেছে। এটি পথচলার ছায়া-আরাম, পথের কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি বা বাঁক পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। যে পথের ইঙ্গিত তিনি পেয়েছেন *ছবি ও গান* কাব্যে তারই ধারাক্রমে নবযৌবনের উদ্বেগ, আবেগ ও দ্রোহের আভাস — যা যৌবনের তেজ, তার পূর্ণ-প্রায় প্রকাশ আছে *কড়ি ও কোমল* [১২৯৩] কাব্যে। রবীন্দ্রনাথ যৌবনকে ভেবেছেন 'ফুল ও ফসলের প্রেরণা'র কাল হিসেবে, সেই যৌবনের রচনা *কড়ি ও কোমল*, অর্থাৎ কাব্যভাবনায় ছিলেন ফলপ্রসূ জীবনসচেতন। এই কাব্যেই তিনি অনুভব করেছিলেন আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ। তাহলে প্রকাশপরবর্তী সম্পর্ক বা পরিণাম কী ছিল? বিশ্বের সঙ্গে যে যোগের প্রসঙ্গ বার বার এসেছে তা এ কাব্যে সুনিশ্চিত ও নির্দিষ্ট রূপ পেয়েছে। মানুষের সংস্পর্শই আত্মপ্রকাশের পরিণাম; আত্মমুক্তিরও বিশেষ একটি ধরন :

> মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
> মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। ['প্রাণ', *কড়ি ও কোমল*]

রবীন্দ্রনাথ মূলত জানাচ্ছেন বিশ্বপ্রাণের যোগ ও সামগ্রিক মুক্তির কথা। অনৈক্যে অজৈবের বিশৃঙ্খল বিচ্ছিন্নতা দৃষ্ট হয়, জৈবের যোগসূত্রই প্রাণ — এ কেবল প্রকৃতিবিজ্ঞান নয়, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারও। এই পর্বেও আন্তরিক অনুভবই মূলকথা, তবু অন্তরের সঙ্গে

বহির্জগতের সম্বন্ধের ব্যাপারটিও আকৃষ্ট করছে কবিকে। বিলয় বিষাদ বিরহের যদিও পূর্ণ অবসান হয়নি, জীবনের আলোকিত প্রসঙ্গগুলো তবু উত্থিত হচ্ছে, ধরা দিচ্ছে আশাবাদ; কেবল বিনাশ বা অন্ধকার নয়, সূর্যও তো আছে : 'হেথাও তো পশে সূর্যকর।/ ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে/বিদীরিল যে গিরিশিখর—/ বিশাল পর্বত কেটে পাষাণহৃদয় ফেটে/প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর —/ প্রভাতে পুলকে ভাসি বহিয়া নবীন হাসি/ হেথাও তো পশে সূর্যকর!' ['নূতন', *কড়ি ও কোমল*]। শুভ আস্থা ফিরে-আসা নতুন পথেরই লক্ষণ, অন্ধকার ছেড়ে আলোর দিকে, একাকী অন্তরবাস ছেড়ে সংসারের দিকে যাত্রা।

সংসারও রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বপ্রকৃতি নিয়েই তাঁর বিশ্বসংসার। এজন্য কেবল অন্তর নয়, বিস্তার প্রসঙ্গে তৈরি হওয়া উদ্বেগ, দায়বোধেরই যা রূপান্তর, রবীন্দ্রনাথে সৃষ্টি করছে দূরদৃষ্টি। তাকাচ্ছেন ভবিষ্যতের দিকে, এখন কোনো কিছু ফেলে দেয়ার মতো তুচ্ছ নয় — এর দ্বারা সকল বস্তুবিশ্বের সঙ্গে আন্তঃযোগ নিজেকেই বিশ্বের কেন্দ্রে উপস্থাপন ও অধিষ্ঠিত করে। হয়ত তা রোম্যান্টিকতা, তবু স্বীকারের মধ্যে তার ভিত্তি। কালের প্রতি আস্থার কারণে নিজেকে আর নিঃসঙ্গ মনে করছেন না রবীন্দ্রনাথ; কেটে যাচ্ছে বিলাপের বিকল কাল : 'মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,/সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগ-যুগান্তর।' ['ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি', *কড়ি ও কোমল*]। তবু স্মৃতি থাকে, মানবিক বলেই থাকে, ভবিষ্যতের পথ সে রুদ্ধ করতে পারে না। কিছু সংশয় ও প্রশ্নও মনে জেগে ওঠে, যেমন 'পাষাণী মা' কবিতায় পৃথিবীর স্নেহময়ী রূপ নিয়ে প্রশ্ন জাগে, তবু তা আস্থারই স্তরভেদ, 'খেলা' কবিতায়ই তার কমনীয় রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। সংবেদনশীল মনে প্রেমপ্রসঙ্গ বিরহবিলাপের অধিক কিছু, বিশ্বের সঙ্গে তার যোগ : 'আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।/ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।' ['যৌবনস্বপ্ন', *কড়ি ও কোমল*]। প্রাপ্তিযোগে এই পর্যায়ে কবি স্বতন্ত্র অনুভূতির জগৎ লাভ করছেন; এর প্রমাণ আছে 'স্তন', 'চুম্বন', 'বিবসনা', 'বাহু', 'চরণ', 'দেহের মিলন', 'তনু' প্রভৃতি কবিতায়। ভাব ও বস্তুর দ্বৈরথ কবির রিক্ত নয় প্রাপ্তিনিবিড় মনস্তত্ত্বের স্মারক হতে পারে। এতে সম্ভবত ঐতিহ্যিক দায় আছে অনেকখানি — সংস্কৃতকাব্য ও পদাবলীর — দেহকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিকতা দৃষ্টি এড়ায় না এবং তা প্রথাগতও নয়, স্বতন্ত্র। দেহের অস্বস্তিও দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে; দেহের পরিচয়/অপরিচয় নয়, আবদ্ধতাকে ভয় পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ :

> আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
> তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ!
> ... ...
> স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধো না আমায় —
> স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়। ['বন্দী', *কড়ি ও কোমল*]

নারীকে নয়, ভয় পেয়েছেন ক্লান্তিকে। যেখানে অনুভবের বিশ্ব মুক্ত, আকাঙ্ক্ষা যেখানে অনন্ত হৃদয়ের, তার বিপরীতে দেহের সীমা, স্থূল মাংসের চাহিদা দৃষ্টি-অস্তিত্বকে বন্দি করে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ মূলত বৃহৎজীবনে মুক্তি ও পবিত্রতার অনুসন্ধানী। আপাতভাবে বাস্তবাতিক্রমী প্রবণতাও রবীন্দ্রনাথে দৃষ্ট হয় : 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া।/ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে। ... যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল

শ্বাস,/যারে ভালোবাস তারে করিছ বিনাশ।' ['পবিত্র প্রেম', *কড়ি ও কোমল*]। বস্তুর গ্রাস থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই রবীন্দ্রনাথকে কথিত রোম্যান্টিকতার প্রভাব-বলয়ে নিয়ে গেছে। তিনি চলে গেছেন স্বপ্নরাজ্যে; তবে এই নিয়েও দ্বন্দ্ব ছিল। এই দ্বন্দ্বের ভেতরেই নতুনতরকে পাওয়ার ইঙ্গিত রয়ে গেছে : 'এসো, ছেড়ে এসো, সখী, কুসুমশয়ন।/বাজুক কঠিন মাটি চরণের তলে।' ['মরীচিকা', *কড়ি ও কোমল*]। এই আকর্ষণেও দ্বৈরথ বিদ্যমান, এর কারণও বোধগম্য — আদর্শলোকের বিরোধ; অভিমানাহত কবি কখনো ঝুঁকে পড়ছেন নির্জনতার দিকে, 'সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা'। ['বিজনে', *কড়ি ও কোমল*]। তবু শেষপর্যন্ত মানুষ ব্যতীত গতি নেই; দ্বিধাসহ মানুষের মাঝেই কবির যাতায়াত — 'ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে'; আলোকময় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এই পর্যায়ে প্রবল :

> যে গৃহে জানালা নাই সে তো কারাগার —
> ভেঙে ফেলো, আসিবেক স্বরগের আলো।
> হায় হায় কোথা সেই অখিলের জ্যোতি!
> চলিব সরল পথে অশঙ্কিত গতি। ['সত্য', *কড়ি ও কোমল*]

মানুষের সঙ্গ-লালিত সরল পথই মুক্তি। এই পথ দেখায় আকাশের ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারকার প্রতি স্থির বিশ্বাসের মতো এই মুক্তির পথই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন : 'চিরদিন জেগে রবে নিবিবে না আর,/চিরদিন দেখাইবে আঁধারের পার।' ['সত্য']। এই আকর্ষণ দেশপ্রেমের ভিত্তি দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যবোধে; সচেতন ব্যক্তির বাসনার ফাঁদে পড়ার আশংকা থেকেই মুক্তির পিপাসা ধ্বনিত হয় — অবশ্য যুগধর্মও অস্বীকার করা যায় না। কবি সহসাই ফিরে গেছেন আত্মনিবিড়তায়, জীবনতরীর সংকট নিয়ে লিখেছেন : 'বাসনার বোঝা নিয়ে ডোবে-ডোবে তরী —/ফেলিতে সরে না মন, উপায় কী করি!' ['বাসনার ফাঁদ', *কড়ি ও কোমল*]। মুক্তির পথটি খুব সহজ, সংঘে লিপ্ত বা সমর্পিত হওয়া। কবি সেই আহ্বানই একসময় শুনতে পেয়েছেন, এর ভঙ্গিতে দেশপ্রেম আছে, আছে অন্তরের প্রকাশ বা বদ্ধতা ঘুচানোর ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> খুলে ফেলো দ্বার, ভেঙে ফেলো ভয়,
> চলো পৃথিবীর মাঝে।
> ধরাপ্রান্তভাগে ধূলিতে লুটায়ে
> জড়িমাজড়িত তনু,
> আপনার মাঝে আপনি গুটায়ে
> ঘুমায় কীটের অণু।
> চারি দিকে তার আপন-উল্লাসে
> জগৎ ধাইছে কাজে,
> চারি দিকে তার অনন্ত আকাশে
> স্বরগসংগীত বাজে!
> চারি দিকে তার মানব মহিমা
> উঠিছে গগনপানে,
> খুঁজিছে মানব আপনার সীমা
> অসীমের মাঝখানে।' ['আহ্বানগীত', *কড়ি ও কোমল*]

মনে হচ্ছিল আত্মবদ্ধতা থেকে পরিত্রাণ যেন পেলেন রবীন্দ্রনাথ; সংশয় আর আভাসে-ইঙ্গিতে দূরাভাস তৈরির পথ বুঝি শেষ হলো। তবে *মানসী* [১২৯৭] কাব্যের 'সূচনা'-অংশে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম-ভারতের প্রেক্ষাপটে নতুনতর কাব্যিক বোধের সঙ্গে পরিচয় লাভের কথা স্বীকার করেও আত্মনিষ্ঠ রোম্যান্টিকতার কুলধর্মই প্রকাশ করেছেন : 'আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরের দ্বারা বেষ্টিত হলাম, অভ্যাসের স্থূল হস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে। এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল।' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ পুনরায় সংসার থেকে দূরে রহস্যে, আত্মলীনতা, সম্মোহিত আকর্ষণ আর অনির্বাণ অতৃপ্তিতে ফিরে গেলেন — এর কার্যকারণ 'অসীমতা'র আত্মলীন বোধে। আত্মযন্ত্রণাময় কস্তুরীগন্ধে মত্ত ও সম্মোহিত কবি আবারো নিরুদ্দেশে ছুটলেন, আবর্তিত হতে থাকলেন, বাইরের দৃষ্টি প্রায় রুদ্ধ করলেন আন্তর সৌন্দর্যের সন্ধানে। বিশ্বমুক্ত কবি অবশ্য কাব্যমুক্তির ইঙ্গিতটি পেয়েছিলেন শিল্পের পথে; কিন্তু 'উপহার'-অংশে ঘোষিত 'রচি শুধু অসীমের সীমা' বস্তুকে অতিক্রম করে অনির্দিষ্ট প্রসারমানতাই প্রকট করে। এতে রোম্যান্টিক সীমা-অবহেলার বদ্ধ বাতায়নই দৃষ্ট হয়, তাই 'মানসী' বিষয়টিও ধোঁয়াশা হতে বাধ্য — রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন : 'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে/গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।' ['উপহার', *মানসী*]। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সম্মোহিত পথচলাই সত্য; আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব ঘটেছে তাও বলা সম্ভব কিংবা রবীন্দ্রনাথ নিজের ভেতরে অনুভব করছেন কোনো নিয়ন্ত্রকসত্তার আবির্ভাব। একে মুক্তি বলা যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয় থাকে, তবে সত্য সংবেদনশীলতা অস্বীকৃত হবে না : 'কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,/এসেছি ভুলে।' ['ভুলে', *মানসী*]। আবার ভুল-ভাঙাটাও দুঃখবোধের ভেতরই আবর্তিত। রবীন্দ্রনাথের ভাবনার কেন্দ্র এখনো সংবেদনশীল আত্মবদ্ধতা, এর প্রমাণ আছে 'ভুল-ভাঙা', 'বিরহানন্দ', 'ক্ষণিক মিলন', 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা', 'আত্মসমর্পণ' প্রভৃতি কবিতায়। কামনা-বাসনা আর সৌন্দর্যতত্ত্বের মূল্য ও অবস্থান নিয়েই তিনি মূলত ব্যস্ত। সম্ভবত মীমাংসাহীন ও আত্মরতিময় ঘেরাটোপে তিনি নিয়তির চাপে আহত হচ্ছেন। তিনি প্রেম অথচ নিষ্কাম কিছুর জন্য, যা আবার অনন্তের — প্রলোভিত হচ্ছেন এবং স্বভাবত ব্যর্থ হয়েই জানাচ্ছেন : 'ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,/কেহ নহে তোমার আমার। ...ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,/চেয়ো না তাহারে।... নিবাও বাসনা বহ্নি নয়নের নীরে,/চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই। ['নিষ্ফল কামনা', *মানসী*]। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কথা রাখতে পারেননি, ঘর-সংসারে ফিরে যাননি। ঘুরেফিরে পাগলা মেহের আলীর মতো একই কথা বলেই গেছেন, এমনই রহস্যময় অজানা প্রলোভন; 'নিষ্ফল প্রয়াস' কবিতায় লিখেছেন : 'দেখ' শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন;/রূপ নাহি ধরা দেয় — বৃথা সে প্রয়াস।' একধরনের ব্যর্থতাবোধ রবীন্দ্রনাথকে আক্রান্ত করছে। এই অসহায়তা থেকে মুক্তির উপায় নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পাবেন। তবে প্রাথমিকভাবে রূপের প্রতিক্রিয়ায় কবি নিজের ভেতরেই ডুবে গেছেন। নিরাকার এক সৌন্দর্যধ্যানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন কবি। এর প্রমাণ আছে 'নিভৃত আশ্রম' কবিতায়; কবির ইচ্ছা আলোকময় সত্তাকে 'রাখিব দুয়ার রুধি আপনার মনে'।

আত্মবদ্ধতার ঘোষণাই এল রবীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে: এর কার্যকারণও অনুভব করা যায় রবীন্দ্রনাথের বর্তমানের দৃশ্যমান বস্তুবিয়োজিত ভাবদর্শনে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া হিসেবে আত্মবদ্ধতার ঘোষণা আসায় তাতে দর্শনের চেয়ে সাময়িক পরিস্থিতির প্রক্ষেপই প্রবল। প্রেম মূলত ব্যবহারোপযোগী মানবিক বিবেচনা, স্বভাবগুণেই রবীন্দ্রনাথ তাতে দর্শনের মাত্রা খুঁজে পান। প্রেম নামের ধর্মনির্ভর আধ্যাত্মিকতা বা একান্ত দেহকাতরতা সংস্কৃত বা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কম নেই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ খুঁজছিলেন নিজের পথ। সেই পথ ধর্ম বা দেহনির্ভরতা নয়, একান্ত মন-নির্ভর, মনেরই আধিপত্য। সেখানে বিচ্ছেদের সুর আছে, আছে প্রেম-পরিধির প্রসারতা, সীমা থেকে অসীমে যাত্রা। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় 'অতি অসহন বহ্নিদহন' নিয়ে সুরদাস আবির্ভূত হয় — কামনার পাপ থেকে মুক্তি তার আকাঙ্ক্ষার বিষয়। কী সেই পাপ? সুরদাসেরই বক্তব্য :

জান কি আমি এ পাপ-আঁখি মেলি
তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা
ওই মুখপানে ধেয়ে!

বাসনার বদ্ধতা থেকে রবীন্দ্রনাথের মুক্তির বাণী বহন করে এনেছে সুরদাস। বস্তু নয়, বস্তুকে অতিক্রমণের মধ্যেই আছে অপার সৌন্দর্য, পরিণামে মুক্তি — রবীন্দ্রনাথের এই বোধের প্রতিবন্ধক তাহলে বাইরের দৃষ্টি। অন্তরের দৃষ্টিকে মুক্ত করার জন্যই বাইরের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ বা বিনষ্ট করতে হবে। সুরদাস তার বাসনাঘন চোখকে — যেখানে ফুটেছে সৌন্দর্য, তাকে মর্মতল থেকে উৎপাটিত করতে চায়। বিশ্বপ্রকৃতি তাকে ভুলিয়ে রাখে, তার ইন্দ্রিয়ের চারপাশে মূর্তি এসে জড়ো হয় — এই শোভা লক্ষ্মীর, এখান থেকেও মুক্তি চায় সে। এই মুক্তির প্রকাশ অনন্ত আঁধারে। অবশ্য শেষপর্যন্ত বোধোদয় ঘটে এই ভেবে যে, দৃষ্টিহীন অনন্ত আঁধারে অন্তহীন জ্যোতিরূপে ভেসে উঠবে মূর্তি। সুরদাসের প্রকৃতপক্ষে বস্তুর বলয় থেকে মুক্তি নেই — অথবা বস্তু নিয়েই মানুষের মুক্তি; বিষয়ের নেতিবাচকতা মুক্তিপথের অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথ মূলত সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্বটিই *মানসী* কাব্যের মুক্তিবোধের মূল নির্দেশনা বা ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন কিন্তু শেষপর্যন্ত এই আবর্তন থেকে মুক্তি পাননি। সৌন্দর্যধ্যানে রবীন্দ্রনাথ দূরতম রহস্যলোকে যাত্রা করেন কিন্তু কিছু পেয়েছেন এমন প্রমাণ দিতে পারেন না। এর ব্যতিক্রম 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটি; এতে জীবনের আবেগে অহল্যার প্রতি প্রশ্নগুলোই মূলত জীবনরূপের সনদ। যা আছে জগতের অন্তস্থ, পাষাণময় — তাই প্রাণরূপে প্রকাশ পায়। কবিতাটিতে অন্তস্থ বহমান এই রূপের রূপক তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বের প্রাণপ্রবাহের সৌন্দর্যকে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তরীভূত অহল্যার জেগে ওঠার সঙ্গে তুলনা করেছেন, এ হলো প্রাণের প্রকাশ, সৌন্দর্যের মুক্তি। প্রাণময় বিশ্বপরিচয় সম্পর্কে কবির বক্তব্য :

অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন —
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে

এক বৃন্তে। বিস্তৃতসাগরনীলনীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।
তুমি বিশ্ব-পানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়;
দোঁহে মুখোমুখি। অপাররহস্যতীরে
চিরপরিচয়-মাঝে নব পরিচয়। ['অহল্যার প্রতি', *মানসী*]

বস্তুর আধারেই অবশেষে রবীন্দ্রনাথ পেলেন প্রাণপ্রতিমা, তাঁর সৌন্দর্যধ্যানের ফল। যেখানে আলো সেখানে তৈরি হয় বস্তুর সীমা, এই সীমাই জীবনসৌন্দর্য। আলোকিত জীবন তাই বস্তুপ্রতিফলিত, অবশ্য থাকতে হবে চোখের আলো। এরদ্বারা সুরদাস সরে গেল অনেকটা দূরে। পর্বান্তরে তৈরি হবে নতুন পথ।

আকর গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (বঙ্গাব্দ ১৪১৫)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী।

সহায়ক গ্রন্থ

গুণময় মান্না। (১৯৯৩)। *রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমি*, কলকাতা : প্যাপিরাস।
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। (১৯৮৭)। *লোকায়ত দর্শন* প্রথম খণ্ড, কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
.......(২০০৭)। *ভারতীয় দর্শন* প্রথম খণ্ড, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।
মো. মতিউর রহমান। (২০০০)। *বাঙালির দর্শন : মানুষ ও সমাজ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।
শৈলেশরঞ্জন ভট্টাচার্য। (১৯৮৮)। *অস্তিত্ববাদের মর্মকথা*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
সিরাজ সালেকীন। (২০১০)। *রবীন্দ্রকাব্যে আলোকভাবনা*, ঢাকা : ধ্রুবপদ।
সুকুমারী ভট্টাচার্য। (১৯৯৭)। *নিয়তিবাদ : উদ্ভব ও বিকাশ*, কলকাতা : ক্যাম্প।
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। (২০০২)। *উপনিষদ*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।